প্রাগৈতিহাসিক কেচ্ছা-১০ (শেষ পর্ব)

(মেজর, মাখন, মজু নামের বালকেরা আজ হতে ষাট বছর আগে গাজীপুরের এক গন্ডগ্রামে বনে বাদারে ঘুরে বেড়াত। সে ছিল এক প্রাগৈতিহাসিক কাল। সমাজে মানুষের পাশাপাশি জ্বিন-পরীদেরও অবাধ বিচরণ ছিল। জঙ্গলে বাঘ ছিল, হরিণ ছিল। আর ছিল ডোবা-নালা-বিল-হাওড়ভর্তি অজস্র মাছ। প্রাগৈতিহাসিক সেই সমাজ নগর-সভ্যতার অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে বহুকাল আগে; তবুও হারিয়ে যাওয়া সেই সময় এখনও দীর্ঘশ্বাস ফেলে যায় মনের আকাশে। সেইসব প্রকৃতি-বালকদের রোজনামচার কিছু অংশ স্মৃতিবদ্ধ করার প্রয়াসেই অত্র উপাখ্যানগুলির অবতারণা।)

একটি বটগাছের মৃত্যু

এত অল্পসময়ে চাপাইর বি বি হাই স্কুলের মতো একটা স্কুলে এতটা প্রভাব প্রতিপত্তি হয়ে যাবে কোনদিন কল্পনাও করিনি।

থানা-হেডকোয়ার্টারের একমাত্র স্কুল, বড় বড় লোকের ছেলেমেয়েরা পড়ে। সিক্স-সেভেনে পড়া কোন ছেলে প্যান্টশার্ট জুতোমোজা পরে ক্লাশে আসে - এমন ঘটনা শুধু শহরেই ঘটতে পারে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদের ক্লাশের খগেন,দিলীপ, সুধীর, শম্ভু ওরা সবাই সাহেব সেজে স্কুলে আসে। একেক জনের চেহারার কথাই বা কি বলব, শম্ভু এত সুন্দর যে প্রথম দেখাতেই ওর প্রেমে পড়ে গেলাম। কোনদিন আমার সাথে একটু আধটু কথা বললে কিংবা ক্লাশে পাশে বসলে কৃতার্থ হয়ে যেতাম। শম্ভু শুধু যে দেখতে সুন্দর তাই নয়, স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা বিনোদ বিহারি বসু শম্ভুর ঠাকুর্দা। এমন উচুঘরের একটি ছেলে আমার সাথে খাতির করে কথা বলে ভাবা যায় !

সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে মতি বলল- 'তুই নাকি খগেনদের বাড়ী বেড়াতে গেছিলি, ওদের বাড়ীতে ভাত খাস্'?

হিজলতলী গ্রামের নওয়াব আলী আড়তদারের ছেলে মতি। মাথায় সবার চেয়ে লম্বা, ঘিলুতে সবার চেয়ে খাট। প্রতি ক্লাশে একবার করে ড্রপ খেয়ে সেভেনে এসে থিতু হয়েছে, সেভেনের অচলায়তন ভেঙে এইটে উঠবে তেমন লক্ষণ নেই, হয়তোবা ইচ্ছেও নেই। পাঠ্য বইয়ের জ্ঞান আহরণের চেয়ে অপাঠ্য বইয়ের জ্ঞানের প্রতিই মতির ঝোক বেশী। বিশেষ করে নারীজাতি বিষয়ক বিবিধ জ্ঞানে এই বয়েসেই পেঁকে গেছে সে। নিষিদ্ধ জগতের রোমাঞ্চকর সব জ্ঞান তার কাছ থেকে গোগ্রাসে গিলি।

দস্যু মোহনের বই আনতে সত্যিই বাগ-চাপাইর খগেনদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম একদিন। খগেনের মা খুব আদর করেছিল আমাকে, দুপুরের ভাত না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়ে নি। সুতরাং প্রশ্নের হ্যা-সূচক জবাবই দিতে হয়। আমার স্বীকারোক্তিতে মুখটা কুঁচকে ফেলল মতি, বলল- 'তুই কাফের হয়ে গেছস্ মেজবাহ। তর জাত গেছে, খাড়া দোজখে যাবি তুই। মুসলমানের পোলা হিন্দু বাড়ীতে ভাত খেলে ভাতে কি মিশায় জানস'?

'কী মেশায়' -আমার এই পাল্টা প্রশ্নে মতি এমন দু'টি পদার্থের নাম বলল যা শুনে মাথায় আগুন জ্বলে উঠল আমার, ইচ্ছে হলো ঘুষি মেরে ওর নাকটা ফাটিয়ে দিই। ছিঃ ছিঃ। মায়ের বয়েসী একজন ভদ্রমহিলা, তার সম্পর্কে এমন নোংড়া ইঙ্গিত কেউ করে ? হোক না তিনি হিন্দু !

আমার রাগের খুব একটা তোয়াক্কা করল না মতি। বলল- 'থু তর মায়ের বয়েসী। মন্দিরে পুজা দ্যায়, শুয়োর খায়, কেউটা খায়- তাগো আবার বয়স। মালাউনগো সব কচুকাটা করা উচিৎ। ওরা হিন্দু - হিন্দুস্তানে চলে যাক'।

মতি আগে এমন ছিল না, তার এই তীব্র হিন্দু-বিদ্বেষ ইদানীং গড়ে উঠেছে। বিদ্বেষের পেছনে একটা সুগুপ্ত কারণ আছে। পারিজাত সেন ওরফে পারি স্কুলের সবচেয়ে সুন্দরী, আমাদের ক্লাশে পড়ে। স্কুলের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটি আমাদের ক্লাশে পড়ে এজন্যে আমাদের গর্বের সীমা নাই। পারি সব ছেলেদের নয়নের মনি, ওর সম্মান ক্লাশের সম্মান। ওর সম্মান রক্ষার গুরুদায়িত্ব আপনা আপনিই মতির কাঁধে চেপেছে বলে মতির বিশ্বাস। কারণ মতি ক্লাশের মধ্যে সবচেয়ে বলবানই শুধু নয়. দু'জনের বাড়ীও একই গ্রামে। সুতরাং মতির ধারণা এই নিষ্ঠুর প্রতারক পৃথিবীতে পারির মতো মেয়েকে সে আগলে না রাখলে যে কোন সময় বিপদে পড়ে যেতে পারে মেয়েটি। মতির এই রক্ষাকর্তার ভূমিকা পারির কাছে কতটুকু গ্রহনযোগ্য তা বুঝে উঠতে পারি নাই, তবে মাঝে মাঝে

নিজের রোগা-পটকা দেহটার দিকে তাঁকিয়ে মনে ধিক্কার জমে যেত। হায়, মাথায় ঘিলু একটু কমিয়ে বিধাতা যদি দেহে মতির মতো আরেকটু তাগড়াই দিতেন, তাহলে খারাপ হতো না।
আব্বাস স্যারের ইংরেজী ক্লাশ। দপ্তরী সুনীলদা এসে বলল- হেড মাষ্টার মতিকে জরুরী তলব করেছেন। বিষয়টা কী ? আমাদের হেড-মাষ্টার জে.এন.লাহিরি পৃথিবীবিখ্যাত লোক, কলকাতার ইংরেজী সংবাদপত্রের ইডিটর ছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। আশেপাশের স্কুলের ছাত্রদের সাথে স্কুলের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে যখন বিতর্ক হয়, এই জ্ঞানীগুনী হেডমাষ্টারটিই সেসব ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বড় অবলম্বন। তার সামনে ছাত্ররা তো দুরস্থান, রামবাবু কামাল স্যারের মতো বাঘা বাঘা শিক্ষকরাও ভয়ে কম্পমান। এইরকম একজন প্রবল-প্রতাপ হেডমাষ্টার যখন ক্লাশ সেভেনের সর্বাধম ছাত্রটিকে বিশেষভাবে তলব করেন, তার পেছনে গুরুতর কোন কারণ থাকতেই হয়। মতির মুখের দিকে তাঁকিয়ে আন্দাজ করতে প্রয়াস পাই। সেখানে একরাশ উদ্বেগ ছাড়া আর কিছু নাই। মুখে যতোই বড় বড় বুলি আওড়াক, হেড মাষ্টারের সামনে মতি যে আমাদের চেয়েও বড় ‘মেচি বিড়াল’ তা অনেক দেখেছি।
কিছুক্ষন পর অফিস রুম হতে হেড-মাষ্টারের তর্জন-গর্জন সেই সংগে মতির অভ্রভেদী চিৎকার ভেসে এসে আমাদেরকে আতঙ্কগ্রস্থ করে তুলে। হেড মাষ্টারের এমন উচ্চকণ্ঠ কখনও শুনিনি। বিষয়টা যে মারাত্মক কোনকিছু তাতে কোন সন্দেহ নাই।
রিপোর্ট পাওয়া গেল- হেড মাষ্টার মতির পিঠে একটি জোড়া বেত ভেঙে ফেলেছেন। মতির তেমন কোন অপরাধ ছিল না। পারি’র প্রতি তার মনের লালিত ভালবাসার কথা উল্লেখ করে তাকে একটিমাত্র পত্র দিয়েছিল মতি। মতির যে পরিমান ভাষাজ্ঞান, তাতে তার প্রেমপত্রে কোন্ বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছিল বিধাতা জানেন। আমরা শুধু এইটুকুই জানতে পেরেছিলাম যে তার মধ্যে “চিরসখী, ভুলো না আমায়” শিরোনামে উচ্চমার্গের একটা স্বরচিত কবিতা কোট করা হয়েছিল। গার্জিয়ানদের হাত হয়ে সেই পত্র আজ হেড মাষ্টারের হস্তগত হয়েছে, তাই মতির কপালের এই দুর্ভোগ ! মতির প্রতি সহানুভূতিতে সাধারণ ছাত্রদের মন পরিপূর্ণ হয়ে গেল। যত সুন্দরীই হোক, পারিজাত কাজটি ভাল করেনি। প্রেমের আহ্বানে সাড়া সে না হয় নাই দিল, তাই বলে গার্জিয়ান মহলে বিষয়টিকে চাউড় করা তার ঠিক হয়নি। মতির মতো একজন অসাধারণ বলবান ছেলে চিরদিনের মতো তার শত্রু হয়ে গেল- একি কম ক্ষতির কথা ?
সেই হতে মতি ভীষণভাবে হিন্দুবিদ্বেষী হয়ে গেছে। পারলে সে এখনই সব মালাওনকে ঝেটিয়ে বিদায় করে। সুতরাং খগেন-সুধীরদের সাথে আমার মাখামাখি ভাল না লাগলে মতিকে দোষ দেয়া যায় না।

এখন অঘ্রান মাস, প্রকৃতিতে উৎসবের আমেজ। স্যাৎস্যাতে বর্ষা আর ভাপসা গুমোটকাল শেষ। মাঠঘাট শুকনো খটখটে, কার্তিকের সাংবাৎসরিক আকালের কথা কথা কারও মনে নাই আর। কৃষকের ঘরে ঘরে আমন আর শাইল ধানের সুঘ্রান। ফুরফুরে ঠান্ডা হাওয়া মুহূর্তেই মনকে সতেজ করে তুলে। পিঠাপুলি, হরেকরকম মেলা আর যাত্রা গানের সিজন এসে গেছে। প্রকৃতির এই অথৈ আনন্দসম্ভার আকাশ-বাতাস হতে চুইয়ে চুইয়ে কিশোর-কিশোরীদের মনকেও রাঙিয়ে দেয়, অপুর্ব সঙ্গীত হয়ে বাজতে থাকে।

মাঠে ভলি খেলার কোট কাটা হয়েছে, ”খালপাড় গ্রীন বয়েজ ক্লাব” সেখানে শীঘ্রই এক জমজমাট টুর্নামেন্টের আয়োজন করতে যাচ্ছে। টুর্নামেন্টের একটি গুরুত্বপুর্ণ সভায় যোগ দিতে মাঠের দিকে যাচ্ছিলাম। গিয়ে দেখি বৃহত্তর আরেক সভা চলছে সেখানে। বড়দের সভা, প্রধান বক্তা ফখর ভাই। তিনি ইতিমধ্যেই ইউনিভার্সিটির সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করে গ্রামের যুবকদের মুকুটহীন সম্রাট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অতি শীঘ্রই তিনি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে যাবেন, গাঁয়ের লোকদের এইরুপ উঁচু প্রত্যাশা।
ফখর ভাই বললেন- ‘আজকেই ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করতে হবে আমাদের। এই বাহিনীর মেম্বাররা চব্বিশ ঘন্টা পাহারা দিবে যেন বাইরের লোক আমাদের গ্রামে এসে কোন গন্ডগোল করতে না পারে। মোট কথা, আমাদের গ্রামে হিন্দুদের উপর কোন অত্যাচার আমরা হতে দেব না। চৌদ্দ

পোস্তান ধরে তারা আমাদের সাথে বসবাস করছে, তারা আমাদের প্রতিবেশী। মিল হতে কিছু গুন্ডা-বদমায়েশ এসে বিনা দোষে তাদের উপর হামলা করবে, তাদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দিবে, মাবোনদের উপর অত্যাচার করবে, আর আমরা তা চেয়ে চেয়ে দেখব ? তা'হলে আল্লাহতায়ালা কি আমাদের উপর বেজার হবেন না, আল্লাহর আরশ কি থরথর করে কেঁপে উঠবে না ? কী বলেন ভাইসব, আপনারা সবাই আমার সাথে একমত তো'?
সবাই একযোগে তাকে সমর্থন করলো। শুধু তফেজ আলী বলল-'শুনছি ইন্ডিয়ায় নাকি সব মুছলমানগো কচুকাটা করতাছে, মুসলমান মা-বইনগো ইজ্জত নষ্ট করতাছে। হের লাইগাই তো শ্রমিকরা এত খেইপা গেছে'।
ভাই বললেন- 'এটা তুমি কী বললা তফেজ ! কোথায় কোন ইন্ডিয়ায় এক হিন্দু দোষ করছে, তার জন্যে সাজা দিবা আরেকজনকে ? আমাদের গ্রামের হিন্দুরা কী দোষ করছে, কও ? তুমি কি রামের দোষে শ্যামকে সাজা দিতে চাও ? শুন তফেজ, আমাদের ধর্ম ইসলাম, দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে শান্তির ধর্ম ইটা। নিজের জীবন দিয়া বিপদগ্রস্থকে রক্ষা করা ইসলামের সবচেয়ে বড় শিক্ষা, কোরানহাদিসে পষ্ট লেখা আছে। আমার কথা বিশ্বাস না হয় মুন্সী চাচারে জিজ্ঞাস কইরা দেইখো'।
ফখর ভাইর ভাষণে মন্ত্রের মতো কাজ হলো, কারও আর মুন্সী চাচার কাছে যাওয়ার গরজ আছে বলে মনে হলো না। তফেজ বলল- 'তোমার কথা তো ঠিকই। তয় আরেকটা কথা। মুরুব্বীরা কেউ এহানে উপস্থিত নাই, কফিলউদ্দি মাষ্টারের পাড়া হইতে কেউ আসে নাই। শুনছি- মাষ্টার সাবের সাথে নাকি মিলের শ্রমিকদের যোগাযোগ আছে। আমাগো নিজেদের মধ্যে যদি একতা না থাকে, মিলের শ্রমিকরা যখন দল বাইন্ধা আইসা পড়ব- তখন সামলাইতে পারবা তো ? পরে আবার আমাগো বাড়ীঘরে না হামলা কইরা বসে'।
ভাই বললেন- 'কে কোথায় কোন্ মতলবে ঘুরে আমার কাছে সব খবর আছে তফেজ। রাজেন্দ্র মন্ডলের বাড়ী আর জমিগুলি দখল করার জন্যে কার জিভ দিয়া জল গড়াইতেছে সব জানি আমি । আচ্ছা তোমরাই কও, এইজন্যে কি কায়েদে আজম পাকিস্তান বানিয়েছিলেন ? আজ যদি তার স্বপ্নের পাকিস্তানে নির্দোষ লোকের উপর অত্যাচার হয়, কবরে থেকেও কি তিনি শান্তি পাবেন ? বাড়ীঘর জমিজিরাতের জন্যে কোন শয়তান যদি আমাদের চোখের সামনে নিরিহ লোকদের উপর অত্যাচার চালায় আর আমরা যুবকরা তার প্রতিবাদ না করি, বিনাপ্রতিবাদে মেনে নিই- তাহলে আর এই পল্লীমঙ্গল সমিতি রেখে লাভ কী ? আরেকটা কথা তোমাদের বলি, আমি থানার বড় দারোগার সাথে আলাপ করেছি। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন, বিপদে আপদে থানার ফোর্স আমাদের সাথে থাকবে'।

ঢাকায় নাকি রায়ট শুরু হয়েছে। ভাই কাল টঙ্গীতে রায়টারদের হাতে পড়েছিলেন, মিলের শ্রমিকরা তার বাস থামিয়ে চেক করেছে বাসে কোন হিন্দু আছে কিনা। ভাই হিন্দু না মুসলমান প্যান্ট খুলে তার পরীক্ষা নিয়েছে রায়টাররা। বোর্ড বাজার, গাছা প্রভৃতি বড় বড় হিন্দু গ্রামগুলিতে শ্রমিকরা আগুন লাগিয়েছে। রাস্তার পাশে অগনিত মানুষের লাশ পড়ে থাকতে দেখেছেন তিনি। গ্রামে ফিরে তাই তিনি হিন্দুদের রক্ষার জন্যে গ্রামের যুবকদের সংগঠিত করছেন, আমাদের গ্রামে কিছুতেই হিন্দুদের উপর অত্যাচার হতে দেবেন না তিনি। তার এই উদ্যোগকে সবাই স্যোৎসাহে সমর্থন জানাল। খুব ইচ্ছে করছিল এই দলে থাকতে, কিছু একটা করতে, কিন্তু সপ্তম শ্রেনীর একজন পুচকে ছেলের পক্ষে এমন মহান কাজে চান্স পাওয়ার কথা চিন্তাই করা যায় না।
দিনগুলি যেন কেমন ভারী হয়ে আসছে, সবার মনে একটা ভয় ভয় ভাব। মিলের শ্রমিকরা যেকোন সময় হিন্দু পাড়ায় হামলা করতে পারে বলে জোর গুজব। গ্রামের যুবকরা হ্যাজাক বাতি জ্বলিয়ে সারা রাত পাহারা দেয়। সন্ধা হলে দক্ষিন দিকের আকাশে মাঝে মাঝে লাল আভা দেখা যায়, ঘর-পোড়ানোর আগুন। আমরা কৌতুহলী চোখে সেই আগুনের আভার দিকে চেয়ে থাকি। দাঙ্গাকারীরা নাকি টঙ্গী থেকে আমাদের এদিকেও চলে আসছে। কাল মৌচাক এলাকায় হিন্দু বাড়ীতে হামলা হয়েছে। মিলের শ্রমিকদের সাথে পল্লীমঙ্গল সমিতির যুবকেরা পেরে উঠবে তো ? হাজার হাজার শ্রমিক, আমাদের গ্রামে কয়জন মানুষই বা আছে।

মজিবর বলল- 'এত সোজা না। শুনস নাই, একদল লেবার আইজ সকালে বাস ষ্ট্যান্ডে আইসা নামছিল। সবার হাতে বল্লম আর লোহার রড। সক্কলে মিলা এমন ধাওয়া দিছে হালাগো, কোনমতে জান নিয়া ভাইগা গেছে। আক্কেল থাকলে আর এদিকে আসার সাহস পাইব না'।

মজিবরের কথায় মনে বল পাই।

এমন সময় দুঃসংবাদটি নিয়ে হাজির হয় তৌফিক। বলে- 'তাতো বুঝলাম, শ্রমিকরা আইতে পারব না। কিন্তু পাড়ার লোচ্চাগো হাত থেইকা বাচাইব কেডা ? কাইল রাইতে লালটেকিতে কী হইছে শুনস নাই'?

কী হয়েছে ? আমরা কিছু শুনি নাই।

তৌফিক যে লোমহর্ষক কাহিনী বর্ণনা করল তা শুনে আমাদের বুকে রক্ত চলাচল থেমে গেল। রোজ কেয়ামত নাজেল হতে আর বাকী নাই।

মোহন রায় লালটেকি গ্রামের হিন্দু পাড়ার মাথা। তিনি উচ্চশিক্ষিত লোক, ঢাকার কোন এক ব্যাঙ্কে উঁচু পদে চাকরি করেন। মোহন রায়ের বউ অনামিকা রায় ডাকসাইটে সুন্দরী, হারমোনিয়াম বাজিয়ে চমৎকার গান করেন। দশমীর দিন ছেলে কোলে সিঁদুর পড়া অনামিকা রায়কে আমি বেশ কয়েকবার দেখেছি। মানুষ যে এত সুন্দর এত প্রীতিময় হতে পারে অনামিকা রায়কে না দেখলে তা উপলব্ধি করতে পারতাম না।

দাঙ্গাকারীরা মৌচাক পর্যন্ত চলে আসায় লালটেকির হিন্দুরা প্রমাদ গুনে, কারণ লালটেকি মৌচাক হতে খুব বেশী দুরে না। গতকাল সন্ধায় গাবতলী গ্রামের তেলী মেম্বারের ছেলে মাসুদ এসে মোহন রায়কে বলে- 'কাকা, ভাবগতিক ভাল ঠেকছে না। যে কোন সময় হামলা হইতে পারে। বাবা আমাকে পাঠাইছে বৌদিদিগো আমাগো বাড়ীতে নিয়া যাইতে। কয়েকদিন আমাগো বাড়ীতে থাকুক, অবস্থা একটু ভাল হইলে চইলা আসব'।

আজন্ম প্রতিবেশী সুখদুঃখের ভাগীদার এই যুবকদের উপর বিশ্বাস না করে মোহন রায় আর কী করেন ? সোনাদানা ও নগদ টাকাপয়সা পোটলাবন্দী করে ছেলে, ননদ ও বৃদ্ধা শাশুরিকে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় মাসুদের সাথে রওনা হয়ে যান অনামিকা রায়। তবে অনামিকা রায় শেষ রক্ষা পাননি। কাছে রক্ষিত সোনারুপার পুটলির চেয়ে তার দেহের খাঁজ-ভাজে রক্ষিত রূপের পুটলির কদর বেশী ছিল মাসুদের চোখে। মাসুদের অযাচিত সাহায্য-প্রস্তাবের পেছনে কোন মহৎ উৎপ্রেরণা ছিল না, ছিল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অনামিকার রূপযৌবন ছলে-বলে-কৌশলে হরণ করা। মাসুদের উদ্দেশ্য ধরতে পারেননি মোহন রায়। আর ধরতে পারলেও এই ঘোর দুঃসময়ে কীইবা করার ছিল তার ?

গলাচিপার জঙ্গালে রাতভর ধর্ষণ যন্ত্রনা ভোগ করার পর সকালবেলা অনামিকা রায়ের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা কোন সুন্দর নারীদেহ নয়, দলিত মথিত রক্তাক্ত কিছু মাংসপিন্ড যার মধ্যে প্রাণবায়ু কোনমতে ধুকপুক করছে।

কাহিনীটি আমাদের কাছে উদগীরণ করে তৌফিক বললো- 'অখন ক', এই বেজন্মাগো হাত থেইকা কীভাবে বাচাবি ? ফখর ভাই দিনরাইত দল নিয়া পাহারা দিতাছে, আর ওদিকে ওমর আর মোসলেম দিনরাইত মনীন্দ্র মন্ডলের বাড়ীর চাইরপাশ দিয়া ঘুরঘুর করতাছে। ফখর ভাইরে কইয়া দিস্, লালটেকির ঘটনা য্যান আবার কুতুবদিয়াতেও না ঘটে'।

অনামিকা রায়ের কাহিনী এবং তৌফিকের আশংকা আমার স্বপ্নের জগতটাকে মুহূর্তেই চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। মাথার উপরকার নীল সুন্দর আকাশটির মায়াবী আচ্ছাদন ঘুচে গেছে, সেখান থেকে ঝরে পড়ছে গলন্ত সীসার গলগলে আগুন। কিশোর কিশোরীদের কল্পনার রাজ্য - যেখানে নগন্য একজন ডাকাতও রবীনহুড হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে - একজন দস্যু মোহনও অনায়াসে পরম পরোপকারী দেশবান্ধব হয়ে যায় এবং রমার মতো সুন্দরী রমনীর ভালবাসা পায় - সেই সহজ সরল সুন্দর জগতটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন যে জগৎ তা কেবল লোভ, হিংসা, কাম আর পুজরক্তে পরিপুর্ণ।

ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায় আমার। আমার বন্ধু খগেন, শম্ভু, দিলিপ, সুধীর - ওরা কেমন আছে ? পারিজাত নামের সুন্দর ফুলটিরই বা খবর কী ? ওদের পাশের গ্রামেই হামলা হয়েছে, ও ভাল আছে তো ? মতি ওর ওপর যেরূপ খাপ্পা ছিল, সুযোগ পেয়ে শোধ তুলেনি তো ? স্কুল বন্ধ থাকাতে কারও

কোন খবর জানি না। তমছের, লোকমান ওদের সাথে যুক্তি করি- যেভাবেই হোক কাল একবার হিজলতলীর দিকে যেতেই হবে, সকলের খোজ নিতে হবে।

হিজলতলীর পাশের গ্রামটি বরইবাড়ী। পুরো গ্রামে হিন্দুদের বাস। এখানকার লোকের প্রধান উপজীবিকা চিড়া কোটা এবং তা হাটেবাজারে নিয়ে বিক্রি করা। বরইবাড়ীর ধনির চিড়া বিখ্যাত। শাদা শাদা ধবধবে চিড়াগুলি এতই পাতলা যে হাতে নিলে তুলোর মতো উড়ে যায়, মুখে দিলে জিহ্বায় দুধের স্বাদ। বরইবাড়ীর কাছে গেলে দুর হতেই চিড়া কোটার ঢেকুর ঢুকুর শব্দ ভেসে আসে অহরহ। আজ সেখানে কোন শব্দ নাই, বাড়ীগুলিতে কোন মানুষজন আছে বলেও মনে হলো না। আগুনে পোড়া দু'একটি বাড়ী আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়ে শরীরে শিহরণ খেলে গেল।
ছোট্ট একটা বিল, পাকা আমন ধান সোনালি কার্পেট হয়ে মাটির উপর বিছিয়ে আছে। একটা বিষন্ন বক জলের ধারে এক পায়ে ধ্যানস্থ হয়ে আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই সময় বিলের পাড় সরগরম থাকে। কেউ ধান কাটে, কেউ বা বোর ধানের বীজতলা পরিচর্যা করে। নেংটা ছেলের দল কচুরিপানার ভেতর ঠেলা জাল দিয়ে কই মাছ ধরে। শাখাসিঁদুর পরা ঘোমটা দেয়া বধুদের কলসিকাঁখে জল পরিবহনে ব্যস্ত দেখা যায়। আজ মানুষজন নাই বললেই চলে। এক নীরব বিষন্নতার চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে বরইবাড়ী গ্রাম। ভয়ে ভয়ে হিজলতলীর দিকে অগ্রসর হই আমরা।
হিজলতলীতে ঢোকার মুখে ছোট্ট একটা বাজারের মতো জায়গা। কয়েকটা মুদী দোকান যার অধিকাংশই ঝাপ বন্ধ। একটা দোকানমাত্র খোলা, সেখানে কয়েকজন লোক বসে আছে। একজন আমাকে দেখে বলল- 'একি মেজবাহ্, তুই এত দুরে ? বাড়ীতে সবাই ভাল আছে তো, চাচামিয়ার শরীর ভাল আছে'?
মান্থু ওরফে মোহম্মদ আলী ডাক্তার। ন্যাশনাল পাশ ডাক্তার, দু'টাকা ভিজিটে গ্রামে গ্রামে চিকিৎসা বিলিয়ে বেড়ান। অসুখ বিসুখে বেশ কয়েকবার আমাদের বাড়ীতে গেছেন, আমাকে ভাল করে চেনেন। মান্থু ডাক্তারের আরেক পরিচয়, তিনি আমার বন্ধু মতি'র বড় ভাই।
আমি বললাম- 'ইয়ে, মতি বাড়ী নাই ? ওর কাছে একটু দরকার ছিল'।
তিনি বললেন- 'যাও, মতি বাড়ীতেই আছে এখন'।
মতিদের বাড়ীটা বিরাট, মতির বাপ গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে ধনী লোক ।
দু'জন ছেলের সাথে আমতলায় বসে বাঁশের বাখারি চাচছিল মতি । আমাদের দেখে খুব অবাক হলো সে। বললো- 'কী আশ্চর্য, তরা এত দুরে ! আয় আয়, কী মনে করে'?
হিন্দুদের প্রতি যেরূপ বৈরী সে, তার কাছে মনের কথা খুলে বলা যায় না। হিতে বিপরীত হতে পারে। একটু ঘুরিয়ে বলি- 'ওর একটা কাজে বরইবাড়ী সুরেশদের বাড়ী এসেছিলাম। ভাবলাম তর খোজ নিয়া যাই। ইস্কুল বন্ধ, কতদিন তগো সাথে দেখাসাক্ষাৎ নাই'।
মতি বিরসমুখে বলল- 'ইস্কুল কি আর খুলব রে, বেজন্মারা দেশটার যা অবস্থা করছে, হিন্দুরা সব চলে যাবে। হেডমাষ্টার, রামবাবু, পালবাবু সব চলে গেলে আমাগো ইস্কুল চলব কীভাবে, পড়াবে কে'?
মাত্র দিনকয়েক আগেও মতি পাকিস্তান থেকে সব হিন্দুদের বিতাড়ন করার ঘোর সাপোর্টার ছিল। আজ ওর মুখে একি সুর !
বলি- 'তগো গাঁয় হিন্দুগো উপর অত্যাচার হয় নাই তো ? পারিজাতরা কেমন আছে'?
আমার প্রশ্নে মতির চোখ দু'টো জ্বলে উঠল, প্রশস্ত বুকে টোকা দিয়ে বলল- 'মতিউর রহমান বেঁচে থাকতে পারিজাতের গায়ে হাত দিব কোন্ শালায়? লাশ ফেলে দিমু না'।
মতির কথায় অপার আনন্দে মন ভরে যায় আমার। বলি- 'পারিজাতরা কি অগো বাড়ীতেই আছে'?
মতি বলল- 'না, অগো নিরাপদ জায়গায়ই রেখে এসেছি। ঢোল সমুদ্রের নিজামুদ্দি সুবেদারের বাড়ীতে। আমি রোজ একবার করে যাই, খোঁজ নিয়া আসি। কোন চিন্তা করবি না, পারিজাতের গায়ে ফুলের টোকাও পড়বে না। আমাগো বাড়ীতেই নিয়া আসতাম, কিন্তু সুবেদার বাড়ীতে আরও নিরাপদে থাকবে। সুবেদার খুবই ভালমানুষ, পরহেজগার মানুষ। তাকে দেখে থানার দারগারাও ডরায়। বড়ভাই আর আমি গিয়া হরমোহন কাকার পুরা ফ্যামিলি সেখানে রেখে এসেছি, কোন চিন্তা নাই- বুঝলি'?

মতির এই আমুল পরিবর্তন দেখে মনটা নিমেষেই ফুরফুরে হয়ে যায় আমার। ওর সুন্দর নিষ্পাপ মুখটাতে চুমু খেতে ইচ্ছে করে। নাহ্, যতদিন ফখর ভাই আর মতিদের মত লোক আছে – ততদিন চিন্তার তেমন কিছু নাই।

এ বছর মনে হয় বন্যা হবে। আকাশ ভেঙে দিনরাত শুধু ঝরছেই, থামাথামি নাই। তুরাগ ফুসে উঠছে, পাড় ভেঙে আশপাশের গ্রামগুলিকে গিলে নেয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। চারপাশের বিল-হাওড় কানায় কানায় পরিপুর্ণ, পানি ঘরের ডোয়া ছুই ছুই করছে। গরুবাছুর নিয়ে মহি ভাই আগেই বাথান বাড়ীতে পাড়ি জমিয়েছে, সেগুলি সেখানে দুই তিন মাস দিব্বি পিকনিক করে বেড়াবে। মানুষেরই যাওয়ার কোন জায়গা নাই, টং বেঁধে হলেও দাত কামড়ে পড়ে থাকতে হবে, ভিটা ছাড়া চলবে না।
সকালবেলা ঘুম ভাঙতে বাইরে বেরিয়ে অবাক, পানি দুয়ারের ভেতর মাথা ঢুকিয়েছে। কাল বিকেলেও তা আমগাছের তলায় ছিল, রাত্রের মধ্যে এতদুর এসে গেছে ! আমগাছ দুয়ার হতে কম করে হলেও বিশ হাত দুরে, একরাতে বিশ হাত পানি বেড়েছে ! অথচ ছোমেদালি কাকা বলেন মাত্র নাকি আঁধহাত বেড়েছে ! পানি মাপার এই স্কেল বড়রা কোত্থেকে পায়, বুঝতে পারি না।
মাখনাদের ঘাটে একটি বড় ঘাসি নৌকা, সেটাতে জিনিষপত্র তোলা হচ্ছে। মাখনারা কোটবাড়ীতে ওদের মামা বাড়ী চলে যাবে। বন্যার দিনগুলি সেখানে কাটিয়ে পানি নেমে গেলে ফিরবে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। সবাই একে একে চলে যাচ্ছে, শামসুরা গেছে, আওলাদরা গেছে, আজ মাখনারাও চলে যাবে। আমরাই শুধু পড়ে থাকব। আমাদের নানার বাড়ী কেন যে পাহাড়ে হলো না ?
মাখনের মা বিদায় নিতে এসে মাকে বলল- 'বুজি যাই। তোমারে কত কইরা কইলাম রাজী হইলা না। চুলায়, নোটে - সবজায়গায় পানি উইঠা গেছে। ধানই বা ভানবা কেমনে, রান্নাবান্নাই বা কীভাবে করবা'?
মা বললেন- 'কইলেই কি আর এতগুলা পোলাপান নিয়া কারও বাড়ীত যাইয়া উঠন যায় মাখনের মা। তুই যা, চিন্তা করিস না, আল্লায় এক জো করবই। তা'ছাড়া বাড়ীতে কাউকে না কাউকে তো থাকতেই হইব। বাড়ী খালি কইরা সবাই চইলা গেলে চোর আইসা ঘরের টিনটুন কড়ি-বরগা সব খুইলা নিয়া যাইব না'?
মাখনরা চলে গেল। থৈ থৈ সমুন্দুরের মাঝে পরিত্যক্ত দ্বীপের মতো ভাসছে আমাদের গ্রামটি। মাখনের এত সাধের কলার ভেলাটি অসহায়ের মতো পিটকাল গাছে বাঁধা আছে, চড়নদার নাই। সেদিকে তাঁকাতে বুক ফেটে কান্না এল। সারাদিন করার মতো কিছুই নাই। মাছ ধরে যে সময় কাটাব সে জো নাই, কারণ কেঁচো পাওয়া যায় না, সব পানিতে ডুবে গেছে।
বাবা সাহেবালি চাচাকে বললেন- 'বাঁশের জোগাড় কইরা রাখন দরকার। পানি যেভাবে বাড়ছে দুই একদিনেই ঘরে উঠব। মাঁচা বানানো লাগতে পারে। সকালে মাঝিগো কাছে শুনলাম উজানে অখনও পানি বাড়ছেই, তার মানে আমাগো এখানে সপ্তা খানেকের মধ্যেও পানি কমার কোন সম্ভাবনা নাই'।
বাবাকে বড়োই চিন্তিত মন হয়। সাহেবালি চাচা হুক্কাটা বাবার হাতে দিতে দিতে বললেন- 'যা অবস্থা, মনে হইতেছে পোলাপান টোলাপান সব টানে পাঠিয়া দিলেই ভাল হইত। এরপর তো নাও জোগাড় করাও মুশকিল হইব'।

এমন সময় ঘাটে একটা ছৈ-ওয়ালা নৌকা এসে ভিড়ল। নৌকা থেকে যিনি নামছেন তাকে দেখে আমার বুকে চমক লাগে। উশির বাবা শশধর ঠাকুর। প্রাইমারি স্কুল থেকে হাইস্কুলে উত্তরণের পর উশি হাওয়া হয়ে গেছে, ঢাকা শহরে তার কোন এক মাসির বাড়ীতে থেকে লেখাপড়া করে। বহুদিন হয় উশির সাথে যোগাযোগ নাই, আজ হঠাৎ করে তার বাপকে দেখে মনটা খুশী হয়ে উঠল!
শশধর ঠাকুর বাবার ভাল বন্ধু, তুই-তোকারি সম্পর্ক। ওনারা এখন নিরিবিলিতে আলাপ করবেন, ফাসী হুক্কায় সুগন্ধী তামাক খাবেন, কী নিয়ে যেন হো হো হাসির ফোয়ারা ছোটাবেন, সেখানে আমাদের থাকা মানা। তবে আজকাল ঠাকুরকে আর আগের মতো প্রাণচঞ্চল মনে হয় না, তিনি অনেকটাই যেন বুড়িয়ে গেছেন।

রাত্রে বাবা-মা'র মধ্যে আলাপ হচ্ছিল। বাবা বললেন- 'পানি যেভাবে বাড়তাছে, আইজ কাইলের মধ্যেই ঘরে পানি ঢুকব। তুমি পোলাপান নিয়া সইরা গেলেই ভাল করতা। বাড়ী পাহারা দেওয়ার জন্য সাহেবালিরা তো আছেই'।
মা বললেন- 'ঢংয়ের কথা শুইনা আর বাঁচি না, যাওনের য্যান কত মুল্লুক পইরা রইছে। মাঁচা বানানের ব্যবস্থা করেন, আগের বন্যা যেভাবে কাটাইছি এবারও সেভাবেই কাটামু'।
বাবা মুচকি হেসে বললেন- 'শশী বন্যার দিন কয়ডা তার বাড়ীতে গিয়া কাটাইতে খুব কইরা রিকুয়েস্ট করল রহি'র মা। ছোটবেলাকার বন্ধু, অর কথা কীভাবে ফালাই কও দেখি'?
বাবার কথা শুনে উত্তেজনায় শিড়দাড়া খাড়া হয়ে যায় আমার। উশিদের বাড়ীতে যাব, সেখানে থাকব ! কী সাংঘাতিক সংবাদ !
মা চিরকালই শুভ কাজে বাগড়া দিয়ে এসেছেন। বললেন- 'মনের কথাডা খুইলা কন্ দেখি। জীবনভর কত বন্যা আইল, কখনও তো শশধর ঠাকুরকে নিমন্তন্ন করতে দেখলাম না। ইবারই হঠাৎ কইরা তার মনে দরদ উইথ্লা উঠল, বিষয়ডা কী'?
বাবা বললেন- 'তাইলে শুন, কইও না কারও কাছে। শশী জরুরী কাজে কইলকাতা যাইব, বাড়ী ফাকা রাইখা যাইতে চায় না। রায়টের পর থেইকা ও আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারতাছে না, এমুনকি ওর যজমানগোও না। শুন নাই, চাপাইরের বিনোদ সা বাড়ীঘর খালি রাইখা কইলকাতা গেছিল, কলুপাড়ার কলুরা সব দখল কইরা নিছে। শশী আমার হাতে ধইরা অনুরোধ করল- বন্যার ছুতোয় আমি অর বাড়ীতে গিয়া উঠি, ও যে কয়দিন কইলকাতা থাকে বাড়ীঘর দেখাশুনা করি'।
এবার মা'র গলায় আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। তিনি বললেন- 'শশধর ঠাকুররা তো চইলাই যাইব, বাড়ীডা আমাগো দিয়া যাইব নি ? তুমি তো তার বন্ধু মানুষ, একবার কইয়া দেখ না। ঈশ্, কত বড় বাড়ী, দালানকোঠা'।
বাবা গম্ভীর হয়ে যান এবার। বলেন- 'ছিঃ রহি'র মা। কত বড় মাইন্ষের মাইয়া তুমি, তোমার মুখে এরকম কথা মানায় না। তোমার বাবায় কইত - অন্যের জিনিসের উপর লোভ কইর না, তাইলে পোলাপান মানুষ হইব না। আমি জামাই হইয়াও চিরকাল তার কথা মাইন্য কইরা চলছি। এইরকম লোকের মাইয়া হইয়াও তুমি অন্যের জিনিসের উপর লোভ কর ! আমাগো আল্লায় কীসের অভাব দিছে কও'?
বাবার অকাট্য যুক্তির কাছে মা হার মানেন, তার মুখে আর কোন কথা নাই। বাবার উপর ভক্তিতে মনটা ভরে যায় আমার। আহ্। আমার বাবাটা এত ভাল কেন ? এমন একজন বাবার ছেলে হওয়ার গৌরব আছে। বাঙলাঘর হতে সাহেবালি কাকা মুর্শিদি গান ধরেছেন তখন- "সময় গেলে সাধন হলো না.."। ভরা বর্ষার তেজকাটাল পানি বেয়ে সেই উদাস বাউল সুর মনের দুয়ার ছুয়ে অনন্তের দিকে পাখা মেলে দেয়।

আমাদের খুব সমাদরের সাথে গ্রহন করলেন শশধর-গিন্নি। আদর করে বড় একটা কোঠা ঘরে তুললেন আমাদের। বিরাট বাড়ী শশধর ঠাকুরের, প্রকান্ড বাগান, পুকুর, গাছপালা। সবচেয়ে বড় কথা, বাড়ীটা এত উচু যে নুহের বন্যায়ও পানি উঠার কোন সম্ভাবনা নেই। মনে ভয় ছিল, উশি হয়তো ঢাকায় আছে। কিন্তু ঘাটে নৌকা ভিড়তেই উশির খুশীমুখ দেখে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। কতদিন দেখি নাই ওকে। বেশ লম্বা হয়ে গেছে উশি, আরও সুন্দর হয়েছে। তবে মনে হলো - কেমন যেন একটা বিষন্নতা ঘিরে ধরে আছে ওকে। আগের সেই উচ্ছলতা সেই প্রাণপ্রাচুর্য নেই ওর আচরণে। আমাকে দেখে বলল- 'কতদিন পরে দেখলাম তোকে। ঈশ্, কত লম্বা হয়ে গেছিস্'। ওর ভাষায়ও কতো শালীনতা এসে গেছে, আমাদের মতো গেঁয়ো ভাষায় কথা বলে না আর। বড্ড দুরের মানুষ মনে হলো উশিকে। সেই উশি আর নেই যে আমাকে একদিন কলম উপহার দিয়ে বলেছিল- 'এই কলমডা তরে দিলাম। এইডা দিয়া তুই বিত্তি পরীক্ষা দিবি'। উশি আর গাঁয়ের সেই দামাল মেয়েটি নেই, সে এখন শহুরে হয়ে গেছে, উষারাণী চক্রবর্তী হয়ে গেছে। একটা অবুঝ বিষন্নতায় ছেয়ে গেল আমার মন, উশিকে পাশে নিয়ে কয়েকটা উজ্জল দিন কাটানোর স্বপ্ন মনের মধ্যে ফিকে হয়ে গেল মুহুর্তেই। ছোট ভাই মোয়াজ্জেমকে দেখি সমবয়েসী অজিতের সাথে পুকুর পাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কত তাড়াতাড়ি খেলার সাথী যোগাড় করে ফেলল সে। আর আমি ? বুঝতে পারলাম- বড় হওয়া বড় দুঃখের, কাছের

মানুষ দুরে সরে যায়। দুর ছাই, সাহেবালি কাকার সাথে বাড়ীতে থেকে গেলেই ভাল হতো। কেন যে এখানে আসতে গেলাম ? দিনগুলি আমি কীভাবে কাটাই এখন ?

উশিদের বাড়ীর পাশে নদীর পাড়ে বিশাল এক বটগাছ। উপর হতে অজগর সাপের মতো পেঁচানো অজস্র ঝুরি নেমে গোটা এলাকা দখল করে নিয়েছে। ঘোর দুপুরেও জায়গাটা রহস্যময় আঁধারে ঢেকে থাকে। হিন্দুরা এই গাছের গোড়ায় মাঝে মাঝে কীসের যেন পুজো দেয়। রাজ্যের বাদুর বাসা বেঁধে আছে গাছটিতে। সন্ধা হলেই বাদুর বাহিনীর ঝটপট ডানার শব্দ শোনা যায়, দিবানিদ্রা শেষে আশেপাশের গ্রামগুলিতে আঁতা পেয়ারা ইত্যাদি ফলফলারি সাবাড় করার অভিযানে বের হবে তারা এখন। বটগাছটি খালপাড় গ্রামের প্রতীক, এর ঝাকড়া মাথাটা বহু দুর থেকে পথিকদের দৃষ্টিগোচর হয়ে বুঝিয়ে দেবে - সামনেই খালপাড় গ্রাম। ভরা বর্ষায় গাছটির গলা পর্যন্ত ডুবে আছে এখন, হাত বাড়ালেই বাদুর ধরা যায়। তবে বাদুর বড় বিশ্রী প্রাণী, দেখলে গা ঘিন ঘিন করে। তা'ছাড়া বন্যার পানিতে অসংখ্য সাপ বাসা বেঁধেছে গাছটিতে, কাছে যাওয়া রিস্কি কাজ হবে। ডালপালার ভেতর কলকল করে বন্যার জল ঢুকছে, আরেক পাশ দিয়ে ঘুণী হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই গাছের নীচেই রয়েছে তুরাগের সবচেয়ে বড় 'কুম', চৈত্র মাসের খরার দিনেও সেখানে বিশ হাত পানি থাকে। সবার ধারণা- এই কুমে দেও আছে। যতো বড় নৌকাই হোক, এখানে ডুবলে আর খোঁজ পাওয়া যায় না। মাঝিরা খুব সাবধানে এড়িয়ে যায় এই ঠাকুরবাড়ীর কুম, এর ঘুণীতে এপর্যন্ত কত নৌকার যে সলিল সমাধি হয়েছে তার ইয়ত্বা নাই। দেও-দানবে বিশ্বাস করার বয়েস পেরিয়ে এসেছি, তবু আসন্ন সন্ধায় কুমের পাড়ে এসে আমার গা শিরশির করে উঠল। তাড়াতাড়ি নৌকার মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেই।

উশিদের বাড়ী হতে শাঁখ বাজানোর শব্দ ভেসে আসছে। মা নিশ্চয়ই নামাজে বসবেন এখন। বামুন বাড়ীতে নামাজ পড়লে জাত যাবে না উশিদের ? একই বাড়ীতে একজন নামাজ পড়ছে, আরেকজন তুলসিতলায় প্রদীপ জ্বালাচ্ছে- কারও জাত যাচ্ছে না ! বেশ মজা তো। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সাময়িকভাবে হলেও বিভেদের বেড়া ডিঙোতে সাহায্য করে; শেয়াল ও কুকুর এক চালায় উঠে প্রাণ বাচায় এ আমার নিজ চোখে দেখা।

একটি বিশাল কৃষ্ণচুড়া গাছের নীচে উশিদের গোলাঘর। গাছের আবছা ছায়ায় গোলাঘরের ধার ঘেষে একটি কিশোরী মুর্তি। পায়ে পায়ে কাছে যেয়ে দাড়াই আমি।
-'কুমের ধারে একা একা কী করছিলি এতক্ষন'?
-'তেমন কিছু না। ঘরে বসে বসে আর ভাল লাগছিল না, নাও নিয়ে একটু ঘুরতে বেরিয়েছিলাম'। সাবধানে জবাব দেই আমি।
কিছুক্ষন দু'জনেই চুপচাপ। অবশেষে নীরবতা ভেঙে বলি- 'কলিকাতা থেকে গ্রামে ফিরবি, না সরাসরি ঢাকায় মাসীর বাড়ি উঠবি'?
আমার কথার কোন জবাব দেয় না উশি। আস্তে আস্তে বাগানের দিকে হাটতে থাকে।
পাশেই একটা কাঁঠালিচাপার ঝাড়, বর্ষার অঢেল পানি খেয়ে সতেজ হয়ে উঠেছে ঝাড়টি। কাঁঠালিচাপার তীব্র গন্ধে বাতাস মৌ মৌ করছে। কাঁঠালি চাপা বিরল প্রজাতির ফুল, বর্ষা ছাড়া ফুটে না। একেকটা ঝাড়ে খুব বেশী হলে দুটো ফুল ফুটে। একটা ফুল ছিড়ে উশির হাতে দিতে খুব ইচ্ছে করছিল আমার। উশি বলল- 'সাবধান। কাঁঠালিচাপার ঝাড়ে কিন্তু সাপ থাকে'।
হেসে বললাম- 'জানি। সাপ দেখে ডরাই না আমি। তোকে একটা কাঁঠালিচাপা দিতে ইচ্ছে করছে খুব, দেই'?
উশি বলল- 'না, ঝোপের কাছে যাবি না কইলাম। মর্দামি দেখাতে হবে না....'।
হাত ধরে টান মেরে ঝোপের কাছ থেকে সরিয়ে আনে আমাকে। ওর স্পর্শে আমার শরীর বাঁশীর মতো বেজে উঠে। আহ্, কতযুগ পরে উশিকে আবার কাছে পেয়েছি। আচ্ছা, উশির সাথে আমার সম্পর্কটা কী, আমি কি ওকে ভালবাসি ? ওর সাথে কথা বললে এক স্বর্গীয় আনন্দে ভরে যায় আমার মন, মনে হয় যুগ যুগ ধরে ওকে পাশে নিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকি। এর নামই কি প্রেম ?

দস্যু মোহন যেভাবে রমার প্রেমে পড়েছিল আমিও কি সেইভাবে উশির প্রেমে পড়েছি ? আমার মনের কথা কি টের পায় উশি ?
উশি বলল- 'এমন ম্যাদা মেরে গেলি কেন রে, ফুল ছিড়তে দেই নাই বলে রাগ হয়েছে'?
আমার হাত তখনও উশির হাতে ধরা। সাহস করে ওর চোখে চোখ রাখলাম, বললাম- 'আমার কথার জবাব দিলি না তো ? কলিকাতা থেকে কবে ফিরবি'?
আমার হাত ছেড়ে দেয় উশি, বলে- 'বাবা আমাকে কেন কলিকাতা নিয়ে যাচ্ছে জানিস'?
আমি আশ্চর্য হয়ে বলি- 'জানি তো। তোরা কমল দাদার বাসায় বেড়াতে যাবি। সেখানে কয়দিন থাকবি, তারপর আবার চলে আসবি তাই না'!
উশি বলল- 'হ্যা, তাই। সবাই চলে আসবে শুধু আমিই আর কোনদিন আসব না। বাবা কলিকাতা যাচ্ছে শুধুমাত্র আমাকে রেখে আসার জন্য। এদেশে আমি আর ফিরব নারে মেজর, কোনদিন না'।
বলতে বলতে ছোখ দু'টি ছলছল করে উঠে উশির, চাপা কান্নায় গলাটা ধরে আসে। ভীষণ অবাক হই আমি, বুকের ভেতর তীব্র যন্ত্রনা তিরতির করছে। দমটা বন্ধ হয়ে আসছে আমার। একি অলুক্ষনে কথা বলছে উশি, কাকা-কাকীমা-অজিত সবাই চলে আসবে শুধু উশিই কোনদিন আসবে না ! যাহ্, তাই কোনদিন হয় ?
উশি বলল- 'হয়। সংসারে এরকমই হয়। রায়টের পর থেকে বাবা-মা আমাকে নিয়ে খুব চিন্তায় পড়ে গেছে। আমি এখন বড় হয়ে গেছি তো তাই। তুই তো রায়ট দেখিস নাই, কীযে কষ্ট কীযে ভয় বুঝবি না। আমরা সাতদিন নটরডেম কলেজের এক ফাদারের বাসায় লুকিয়ে ছিলাম। সাতদিন ঘরের বাইরে বেরুইনি। আমাদের পাশের বাসার অঞ্জলি মাসির মেয়ে সোনালিকে গুন্ডারা ধরে নিয়ে যায়, সোনালির এখনও কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। অঞ্জলি মাসি পাগলের মত হয়ে গেছে। বাবা তাই আমাকে কলিকাতায় রেখে আসবে'।
উশির কথা শুনে বুকটা ভেঙে যায় আমার, সেইসাথে প্রচন্ড এক অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি আমি। সোনালির অপহরণের জন্যে নিজকেই অপরাধী মনে হয় আমার, মনে হয় সোনালিকে যেন আমিই অপহরণ করেছিলাম। উশির চোখে চোখ রেখে কথা বলতে ভীষণ সঙ্কোচ বোধ করি।
আমার কাছে ঘন হয়ে আসে উশি, পিঠে হাত রেখে বলে- 'মন খারাপ হলো ? হবেই তো। দ্যাখ্, আমারও তো কম মন খারাপ না। রাতে ঘুম আসে না। কলকাতা আমার একটুও ভাল লাগে না মেজর। সেবার কমলদা'র বাসায় একমাস ছিলাম। কী ছোট্ট ঘুপচির মতো দুইটা রুম, দম বন্ধ হয়ে আসে। বৌদি ওদেশের মেয়ে, ঘটি। ওঠতে বসতে যন্ত্রনা দ্যায়, সামান্য ভুল হলেই বাঙাল বলে মুখ ঝামটা মারে। আমার ভাষা ভাল না, খাওয়া ভাল না, বসা ভাল না, শোয়া ভাল না, আমরা বাঙালরা নাকি ভদ্রতা জানি না। তুই বল্ মেজর, ঐরকম নরকে মানুষ টিকে কীকরে ? তবু বাবা আমাকে সেখানে রেখে আসবে। এই দেশ এই গ্রাম এই নদী এই বটগাছটা আমি আর কোনদিন দেখতে পাব না। এই বাগানে আমি আর কোনদিন হাটব না, ফুলগাছে পানি দেব না, দুপুরে ঘুঘু'র ডাক শুনব না, কাঁঠালিচাপা ফুটবে কিন্তু আমি কোনদিন আর তার বাস্ নিতে পারব না ! আমি কীভাবে বাচব - বল্তো'?
কান্নায় ভেঙে পড়ে উশি। তার সেই অঝোর কান্না আমার বুকেও সাত সমুদ্রের লোনা জলের বান ডাকায়। উশিকে সান্তনা দেওয়ার ভাষা কোথায় আমার ? উশিকে এই বিপদ হতে উদ্ধার করার কোন উপায়ই কি নেই ?
পুবদিকের আকাশে মস্ত বড় এক চাঁদ উকি দিল। গতকাল ছিল আষাঢ়ি পুর্নিমা, আজকের চাঁদটা গতকালের চেয়েও বড় আর গোলাকার। একদিকে অথৈ বিল আর ভরা নদীর বুকে রুপাগলা অপার্থিব নিসর্গ মনকে ভরিয়ে দেয়, আরেকদিকে বহু দুর থেকে ক্ষনে ক্ষনে ভেসে আসা বিদ্যুতের ঝলকানি নিষ্ঠুর উপহাস হয়ে বুকে এসে বিঁধে। মৃদু মৃদু বাতাসে গাছের পাতাগুলি শিরশির করছে। শক্ত করে উশির হাত ধরে বসে আছি আমি, হাতটা ছেড়ে দিলেই চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে উশি। উশিকে হারানোর চেয়ে এই সুন্দর রাতে একেবারে আত্মবিলোপ করা কি শতগুনে শ্রেষ্ঠ নয় ?
আমার মাথায় উশির হাত। সে বলল- 'আমার জন্যে খুব খারাপ লাগবে তোর তাই না ? আমিও কোনদিন তোকে ভুলতে পারব না মেজর, মরার দিন পর্য্যন্ত মনে রাখব'।

‘এ মনে রাখায় কী লাভ আমার ? বেঁচে থেকে চিরদিন মনে রাখার কষ্ট বয়ে বেড়ানোর চেয়ে সবকিছু একেবারে ভুলে যাওয়া কি ভাল নয় ? ভরা তুরাগের বুকে দু’জনে একসাথে হারিয়ে যাওয়ার মতো সুখের আর কী হতে পারে’? এই কথাগুলিই উশিকে বলার ছিল আমার। কিন্তু ঠিক সময়ে ঠিক লোকটির কাছে ঠিক কথাগুলি বলা হয়ে উঠে না জীবনে। আমারও হয়নি। উশি আমার চোখে জল দেখেছিল, আমার কণ্ঠের ফোপানী শুনেছিল, কিন্তু আমার মনের একান্ত ইচ্ছেটি বুঝতে পারেনি সে। কিশোর মনের সেই গোপন কামনাটি বুঝতে পেরেছিল বর্ষার বাতাস। তাই সে এত শীঘ্র আকাশের বুকে মেঘরূপে পুঞ্জিত হয়ে উঠতে পেরেছিল। উশি বলতে পেরেছিল- ‘চল্ যাই। বৃষ্টি নামবে এবার’।

একটি বড় পানশি নৌকায় যাত্রা। গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত পানশিতে, সেখান থেকে ষ্টীমারে করে কলিকাতা। উশিদেরকে কালিয়াকৈর পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বিকেলে বাড়ী ফিরলেন বাবা। চিন্তিত মুখে মাকে বললেন- ‘আকাশের গতিক ভাল না। ভাপসা গরম পড়েছে, ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। চারিদিকে থৈ থৈ পানি, এর মধ্যে ঝড় হলে সব্বনাশ, ঘরদোর কিচ্ছু থাকবে না। তা ছাড়া শশীটা পোলাপান নিয়ে নৌকার মধ্যে, বিপদাপদ না হলেই বাঁচি’।
মা বললেন- ‘আপনার খালি বেহুদা চিন্তা। সুরেন পাকা মাঝি, ঝড়বৃষ্টি দেখলে আগেভাগেই নৌকা তীরে ভেড়াবে’।

মা’র কথাই সত্যি হয়েছিল। সে রাতে ঝড় হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু শশধর ঠাকুরের পানশির কোন ক্ষতি হয়নি। নিরাপদেই বন্দরে নোঙর ফেলতে পেরেছিল সেটি। কিন্তু আশ্চর্য্য ! সকালে উঠে সবাই অবাক হয়ে দেখে - তুরাগপাড়ের শতবর্ষপ্রাচীন বটগাছটি আর নেই। নদীর প্রচন্ড স্রোত তার গোড়াটিকে বহুদিন ধরেই কুরে কুরে শেষ করে ফেলেছিল। সামান্য ঝড়েই উপড়ে গিয়ে তুরাগের বুকে হারিয়ে গেছে সে !

খালপাড় গ্রামের বিখ্যাত ঠাকুর বাড়ীর ভিটাটি এখনও আছে। সে ভিটায় এখন অন্যলোকে সন্ধাবাতি জ্বালে, প্রেমভালবাসার অভিনয় চলে, মেয়েরা আপনমনে ঘরকন্নার কাজ করে, শিশুর হাসিকান্নায় বাতাস মুখর হয়ে থাকে। শুধু কালের স্বাক্ষী বৃদ্ধ বটগাছটি আর নেই। ক্লান্ত পথিকদের ছায়াহীন করে আর অগনিত বাদুরপক্ষীদের গৃহহীন করে হারিয়ে গেছে গাছটি।
উশি-মেজর নামের দু’টি কিশোরকিশোরী বটের ছায়ায় আর লীলা করবে না কোনদিন, চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে তারা............।